
হ য ব
সুকুমার রায়
র ল



92
SR


92
SR

হযবরল

সুকুমার রায়

হযবরল

সম্পাদনা/পূর্ণেন্দু পত্রী



এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ১৯৮৮

প্রকাশক
রঞ্জন সেনগুপ্ত
এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দিল্লী অফিস
৫৩৩ শেখ সারাই ফেজ্ ১
নিউ দিল্লী ১১০ ০১৭

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
কলকাতা

মুদ্রক
স্বপ্না প্রিণ্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৯

দশ টাকা

সম্পাদকের কথা

বাজারে সুকুমার রায় রচনাবলীর ছড়াছড়ি জেনেও, প্রচণ্ড একটা ঝুঁকি নিয়েই আমরা বের করেছিলাম 'আবোল তাবোল'। বেরোবার আগে পর্যন্ত ভয় ছিল, এক ধরনের শিক্ষিত পাঠক ছাড়া অন্য কেউ আগ্রহের হাত বাড়াবেন না হয়তো। কিন্তু বেরনো মাত্রই প্রমাণ হয়ে গেল, একটি রুচি ও তাৎপর্যময় প্রকাশনাকে সর্বস্তরের বাঙালী পাঠক আপন করে নিতে পারেন কত দ্রুত। যান্ত্রিক গতানুগতিকতাকে বাতিল করে ভিন্নতর ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সুকুমার রায়কে হাজির করতে চেয়েছি আমরা বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে। আবোল তাবোল-এর আশাতীত সাফল্য আসলে ঐ ভিন্ন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীরই সাফল্য।

সমালোচনাও যে হয়নি তা নয়। তবে সে-সব এমনই অনাধুনিক যে কানে ঢুকিয়েও মরমে পশতে দিইনি তাদের। সুকুমার রায়ের বই বের করতে চাইলেই অনন্তকাল সুকুমার রায়েরই প্রচ্ছদ এবং অলঙ্করণ ব্যবহার করে যেতে হবে, এমন অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে গেলে আমাদের পিঠের শক্ত শিরদাঁড়ায় টান পড়ে। ফলে অতটা নীচু হতে পারি না। রবিনসন ক্রুসো কিংবা অ্যালিস কিংবা অ্যান্ডারসন কিংবা গ্রীম ভাই কিংবা ঈশপ্‌স ইত্যাদির কাহিনী যুগে যুগে কালে কালে আলোড়িত শিল্পী এবং উৎসাহিত প্রকাশকদের হাতে নতুন চিত্ররূপ ও নতুন গ্রন্থরূপ পেয়ে চলেছে বলেই তো প্রমাণ হয়ে যায় তাদের চিরন্তন আকর্ষণ। না হলেই বরং প্রমাণিত হতো যে সেগুলো একটা বিশেষ কালেরই অব্যবহার্য যখের ধন শুধু। প্রত্যেক যুগের সমকালকে প্রেরণা জোগাচ্ছে না এমন শিল্প অথবা

এমন সাহিত্য কি আখ্যা পেতে পারে নাকি চিরায়তের? আমাদের দেশেও তো ঘটেছে এমন ঘটনা যেখানে অবনীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা মলাট থাকা সত্ত্বেও সিগনেট প্রেস নতুন করে আঁকিয়েছেন বুড়ো আংলা-র প্রচ্ছদ। এদেশে নানা শিল্পীর হাতে নানাভাবে অলঙ্কৃত হয়েছে 'ক্ষীরের পুতুল'। এতে কি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে ঘাটতি পড়েনি কোথাও? না। বরং ক্রমোন্নত হয়েছে গ্রন্থ-অলঙ্করণের মান।

আরেক সমালোচক ঠাট্টা ছুঁড়েছেন বারো বুদ্ধিজীবীর তেরো উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থসম্পাদনার অকৃতকার্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। যথার্থ কিছু লিখে লেখক-হওয়া সমালোচকের চেয়ে ঘটনাচক্রে লেখক হয়ে-ওঠা সমালোচকরা চিরদিনই ভয়াবহ। ফলে সুরেশ সমাজপতি-মার্কা শিকড়হীন সমালোচকদের হাত থেকে কোনো সময়েই নিস্তার জুটবে না কোনো সমাজের। এটা জানা আছে বলেই বালকোচিত বাচালতাকে উপেক্ষা হানা আমাদের পক্ষে সহজ। সুকুমার রায়ের সমগ্র রচনাকে শুধুমাত্র ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারে প্রকাশিত করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য হলে, একাজে ব্রতী হতাম না কখনোই। আমরা চেয়েছি খণ্ডে খণ্ডে বেরোনো সমগ্র সুকুমার রচনাবলীর সঙ্গে সমগ্র সুকুমার রায়কেও পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে। 'হযবরল' আমাদের সেই পরিকল্পনার দ্বিতীয় বই। এ বইয়ের পরিশিষ্ট অংশের পাতাগুলো ওল্টালেই পাঠক সহজেই অনুমান করে নিতে পারবেন কীভাবে খণ্ডে খণ্ডে সমগ্র সুকুমার রায়ের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় গড়ে তুলতে চাইছি আমরা, তথ্য ও তত্ত্বের, সমাচার ও সমালোচনার সহাবস্থানে।

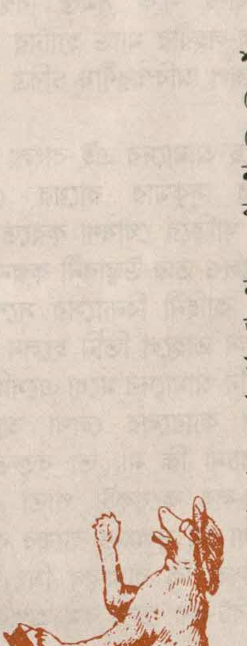
ভূমিকা

সেই আদ্যিকাল থেকে ছোটদের জন্যে রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যা ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী থেকে শুরু করে ভূত প্রেত দত্যিদানব কত রকম কত আশ্চর্য গল্পই না বানানো হয়ে আসছে।

মানুষ আঁকড়ি-কাটা রেখায় অক্ষরের বাঁধনে তার মুখের ভাষার শব্দকে যখন থেকে ধরে রাখবার কেরামতিতে হাত পাকিয়েছে তখন থেকেই গল্পের যত রকম ধারা সম্ভব সবই আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত হয়ে লেখায় রেখায় অক্ষরবন্দী হয়ে গেছে বলে আমাদের জানা ছিল। তার পরেও নতুন কোনো নতুন গল্পের ধারা সৃষ্টি হতে পারে একথা কেউ কল্পনাও করেনি।

কিন্তু দূর অতীত নয় এই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সত্যি সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার গল্পের সৃষ্টি করেন আর সে ধারার স্রষ্টা হলেন জাত-সাহিত্যিক যাকে বলে তেমন কেউ না, তার বদলে একজন সত্যিকার গাণিতিক, আধুনিক গণিত আর ইউক্লিড সম্বন্ধে যিনি অতি মূল্যবান কটি গবেষণা লিখে গেছেন।

এই লেখকের নাম হল লিউইস ক্যারল। চির কুমার এই পণ্ডিত মানুষটিই ১৮৩২ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত এই ৬৬ বৎসরের জীবনকালে তাঁর বিদ্যায়তনের সর্বাধ্যক্ষ ডীন লিডেলের ছেলেমেয়েদের শুনিয়ে খুশি করতে এমন এক জাতের গল্প তৈরি করলেন বিশ্বসাহিত্যে যা সম্পূর্ণ নতুন।



ডীন লিডেলের ছেলেমেয়েদের একজনের নাম ছিল অ্যালিস। সেই অ্যালিস ও তার ভাইবোনেদের কাছে বলা গল্পগুলি সাজিয়ে প্রথম যে বইটি তিনি বার করেন তার নাম হল অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড। এরপরের বই-এর নাম হল অ্যালিস থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস।

এই দুটি বই বিশ্বের গল্প সাহিত্যে যে উদ্ভট আজগুবি কল্পনার ধারা সৃষ্টি করল তা সম্পূর্ণ অভিনব।

ক্যারলের রচনার অনুসরণে ও অনুপ্রেরণায় পৃথিবীর বহু ভাষাতেই তারপর এই নতুন ধারার গল্প লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। তার মধ্যে একটি



দুটির নাম করতে গেলে ইতালীর গল্প পিনোকিও কি ফরাসী ব্লুবার্ড-এর কথা অনেকেরই মনে পড়বে। আমাদের বাংলা ভাষায় অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' কি রবীন্দ্রনাথের 'সে' রচনাতে ক্যারলের উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যের প্রভাব আছে বলেই মনে হয়।

কিন্তু অল্প বিস্তর মিল অমিল যা-ই থাক সমস্ত বিশ্বসাহিত্যে অ্যালিসকে নায়িকা করে-নিয়ে-বলা গল্প-লহরীর ম্যাড হ্যাটার হোয়াইট র‍্যাবিট ইত্যাদির মত উদ্ভট অথচ অপরূপ অবিস্মরণীয় চরিত্র কোথাও পাওয়া গেছে কি?

হ্যাঁ তা গিয়েছে, আর পাওয়া গিয়েছে আমাদের এই বাংলা ভাষারই এক ক্ষণজন্মা অদ্বিতীয় কাহিনীকার সুকুমার রায়ের লেখায়। অতিশয়োক্তির মত শোনালেও সত্যের খাতিরে ঘোষণা করতে হয় যে লিউইস ক্যারলের কাছে অনুপ্রেরণা পেলেও তার উদ্ভাবনী কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত মৌলিক চরিত্র ও কাহিনী বিন্যাসের সন্দেহাতীত প্রতিভার পরিচয় যদি কেউ দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি হলেন সুকুমার রায়, মাত্র ছত্রিশ বছরের পরমায়ু নিয়ে যিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন।

তাঁর হ-য-ব-র-ল সত্যিই লিউইস ক্যারলের লেখা অ্যালিসের উপাখ্যানের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত রচনা কি না, তা বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার দরকার হয় না। হ-য-ব-র-লর কয়েকটা পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই পড়ুয়া-মন স্বীকার করতে বাধ্য হয় সুকুমার রায়ের কাক্কেশ্বর কুচ কুচে কি, কি হিজ বিজ বিজ কিংবা কি ব্যাকরণ সিং লিউইস ক্যারলের ম্যাড হ্যাটার কি হোয়াইট র‍্যাবিট-এর চেয়ে কম অপরূপ সৃষ্টি নয়।

অসামান্য প্রতিভার দীপ্তিতে মাত্র তিন দশকের পরমায়ুতেই যিনি শত অন্তেও অবিস্মরণীয়, সেই অসামান্য কাহিনীকার সুকুমারকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যে বর্তমান প্রকাশক তাঁর অসামান্য রচনা হ-য-ব-র-ল নতুন করে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করে যথার্থই বাঙলার পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞভাজন হলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বলল, 'ম্যাও!'

কি আপদ! রুমালটা ম্যাও করে কেন!

চেয়ে দেখি রুমাল তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটা-সোটা লাল টক্‌টকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, 'কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।'



অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।'

আমি খানিক ভেবে বললাম, 'তাহলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।'

বেড়াল বলল, 'বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।'

আমি বললাম, 'চন্দ্রবিন্দু কেন?'

শুনে বেড়ালটা 'তাও জানো না?' বলে এক চোখ বুজে ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

বেড়াল খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?'



আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেই রকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে-সঙ্গে হুঁ-হুঁ করে গেলাম। তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।'

আমি বললাম, 'বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না?'

বেড়াল বলল, 'কেন? সে আর মুশকিল কি?'

আমি বললাম, 'কি করে যেতে হয় তুমি জানো?'

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, 'তা আর জানিনে? কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রানাঘাট, তিব্বত, ব্যাস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘন্টার পথ, গেলেই হল।'

আমি বললাম, 'তাহলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার?'

শুনে বেড়ালটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তাহলে সে ঠিক-ঠিক বলতে পারত।'

আমি বললাম, 'গেছোদাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?'

বেড়াল বলল, 'গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছেই থাকে।'

আমি বললাম, 'কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?'

বেড়াল খুব জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, সে হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'কি রকম?'

বেড়াল বলল, 'সে কি রকম জানো? মনে কর, তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তাহলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজারে। কিছুতেই দেখা হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'তাহলে তোমরা কি করে দেখা কর?'

বেড়াল বলল, 'সে অনেক হাঙামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই; তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে;





তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসাব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে। তারপর দেখতে হবে—'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কি রকম হিসেব?'

বেড়াল বলল, 'সে ভারি শক্ত। দেখবে কি রকম?' এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর গেছোদাদা।' বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর তুমি,' বলে ঘাড় বাঁকিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ আবার একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।' এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, 'এই মনে কর তিব্বত'—'এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে'—'এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—'

এই রকম শুনতে-শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, 'দূর ছাই! কি সব আবোল-তাবোল বকছে, একটুও ভালো লাগে না।'

বেড়াল বলল, 'আচ্ছা, তাহলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি যা বলব, মনে-মনে তার হিসেব কর।' আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা-ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, 'সাত দুগুণে কত হয়?'

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি,

এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, 'কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?' তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা দাঁড়কাক শ্লেট পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে, আর এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, 'সাত দুগুণে চোদ্দ।'

কাকটা অমনি দুলে-দুলে মাথা নেড়ে বলল, 'হয়নি, হয়নি, ফেল্।'

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, 'নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।'

কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।'



আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?'
কাক বলল, 'তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দ হয়নি। তখন ছিল, তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'
আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দ। একঘন্টা আগে হলেও যা, দশদিন পরে হলেও তাই।'
কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?'
আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি রকম?'
কাক বলল, 'এখানে কদিন থাকতে, তাহলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার যো নেই। এইতো কদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটে সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।' বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।
এমন সময়ে হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুরুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।



বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিগগেস করল, 'কই হিসেবটা হল?'
কাক খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'এই হল বলে।
বুড়ো বলল, 'কি আশ্চর্য! উনিশদিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠল না?'



কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল, তারপর জিগগেস করল, 'কতদিন বললে?'

বুড়ো বলল, 'উনিশ।'

কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল, 'লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি।'

বুড়ো বলল, 'একুশ।' কাক বলল, 'বাইশ।'

বুড়ো বলল, 'তেইশ।' কাক বলল, 'সাড়ে তেইশ।' ঠিক যেন নিলেম ডাকছে।

ডাকতে-ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডাকছ না যে?'

আমি বললাম, 'খামকা ডাকতে যাব কেন?'

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখেনি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বন্‌বন্ করে আট দশ পাক ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর হুঁকোটাকে দূরবীনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার-বার দেখতে লাগল। তারপর কোত্থেকে একটা পুরনো দরজীর ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।'

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, 'এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুওর?'

বুড়ো বলল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ।'

দেখলাম ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

তারপর বুড়ো জিগগেস করল, 'ওজন কত?'

আমি বললাম, 'জানিনা।'

বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে-টিপে

বলল, 'আড়াই সের।'

আমি বললাম, 'সেকি, পট্‌লার ওজনই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট।'

কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে তোমাদের হিসেব অন্য রকম।'

বুড়ো বলল, 'তাহলে লিখে নাও—ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।'

আমি বললাম, 'দূৎ! আমার বয়স হল আট বছর তিনমাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিগগেস করল, 'বাড়তি না কমতি?'



আমি বললাম, 'সে আবার কি?'

বুড়ো বলল, 'বলি বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?'

আমি বললাম, 'বয়েস আবার কমবে কি?'

বুড়ো বলল, 'তা নয় তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি? তাহলেই তো গেছি! কোনদিন দেখবো বয়েস বাড়তে-বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি বছর পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি!'

আমি বললাম, 'তা তো হবেই। আশি বছর বয়েস হলে মানুষ বুড়ো হবে না!'

বুড়ো বলল, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না—উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল, এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।' শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল, 'তোমরা একটু আস্তে-আস্তে কথা কও, আমার হিসেবটা চট্‌পট্ সেরেনি।'

বুড়ো অমনি চট্ করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল, 'একটি চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবেনি।' এই বলে তার হুঁকো দিয়ে টেকো মাথা চুলকাতে-চুলকাতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—



'তারপর এদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে-ঘুমুতে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁশি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ-হৈ রৈ-রৈ মার্-মার্ কাট্-কাট্—এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, পক্ষীরাজ যদি হবে, তাহলে ন্যাজ নাই কেন? শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ভালো কথা! ন্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব সুর্‌সুর্ করে পালাতে লাগল।'



এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিগগেস করল, 'বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যাণ্ডবিল?'

আমি বললাম, 'কই না, কিসের বিজ্ঞাপন?' বলতেই কাকটা একটা কাগজের বাণ্ডিল থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল, আমি পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে

৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচরা ও পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি ১৷৵০। CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রঙ, কান কটকট করে কিনা, জীবিত না মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক, হেড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান ! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কাক বলল, 'কেমন হয়েছে?'

আমি বললাম, 'সবটাতো ভালো করে বোঝা গেল না।'

কাক গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভারি শক্ত, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এয়েছিল তার ছিল টেকো মাথা—'

এই কথা বলতেই বুড়ো মাৎ-মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, 'দেখ! ফের যদি টেকো মাথা টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্লেট ফাটিয়ে দেবো।'

কাক একটু থতমত খেয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'টোকো নয়, টেপো মাথা, যে মাথা টিপে-টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।'



বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে-বসে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল। তাই দেখে কাক বলল, 'হিসাবটা দেখবে নাকি?'

বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, 'হয়ে গেছে? কই দেখি।'

কাক অমনি 'এই দেখ' বলে তার শ্লেটখানা ঠকাস্‌ করে টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোটো ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে 'ও মা, ও পিসি, ও শিবুদা' বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।

কাক খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'লাগল নাকি! ষাট-ষাট।'

বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, 'একষট্টি, বাষট্টি, চৌষট্টি —'

কাক বলল, 'পঁয়ষট্টি।'

আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কই হিসেবটা তো দেখলে না?'

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ তাইতো! কি হিসেব হল পড় দেখি।'

আমি শ্লেটখানা তুলে দেখলাম খুদে-খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে— 'ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারৎ খেসারৎ দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার সত্ত্বে অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম মোকররী পত্তনী পাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ৎ।



সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—'

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠল, 'এসব কি লিখেছ আবোল-তাবোল ?'

কাক বলল, 'ওসব লিখতে হয়। তা না হলে হিসেব টিকবে কেন ? ঠিক চৌকসমতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এসব বলে নিতে হয়।'

বুড়ো বলল, 'তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না ?'

কাক বলল, 'হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে। ওহে, শেষ দিকটা পড় তো ?'

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে —

সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা /২৷৷ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।

কাক বলল, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল্-সি-এম্ও নয়, জি-সি-এম্ও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, না হয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তাহলে বাকি তিনটে হল ত্রৈরাশিক। এখন আমার জানা দরকার, তোমরা ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও ?'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে একবার জিগগেস করে নি।' এই বলে সে নিচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, 'ওরে বুধো ! বুধো রে !'

খানিক পরে মনে হল কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে বলে উঠল, 'কেন ডাকছিস ?'

বুড়ো বলল, 'কাকেশ্বর কি বলছে শোন্।'

আবার সেই রকম আওয়াজ হল, 'কি বলছে ?'

বুড়ো বলল, 'বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ ?'

তেড়ে উত্তর হল, 'কাকে বলছে ভগ্নাংশ ? তোকে না আমাকে ?'
বুড়ো বলল, 'তা নয়। বলছে, হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক ?'
একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, 'আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বল।'
বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'বুধোটার যেমন বুদ্ধি ! ত্রৈরাশিক দিতে বলব কেন ? ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে ? না হে কাক্কেশ্বর, তুমি ভগ্নাংশই দাও।'
কাক বলল, 'তাহলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ দিলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের, তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে — খাঁটি হলে দু টাকা চোদ্দ আনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।'
বুড়ো বলল, 'আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফোঁটা জল হিসেবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার শ্লেট, আর এই নাও পয়সা ছটা।'
পয়সা পেয়ে কাকের মহা ফুর্তি ! সে 'টাক-ডুমাডুম্ টাক-ডুমাডুম্' বলে শ্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল।
বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, 'ফের টাক-টাক বলছিস ? দাঁড়া। ওর বুধো, বুধো রে ! শিগগির আয়। আবার টাক বলছে।' বলতে-না-বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কি যেন হুড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নিচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো। হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে, না সে নিজেই পোঁটলার উপর চড়ে বসে, 'ওঠ্ বলছি, শিগগির ওঠ্' বলে ধাঁই-ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল।



কাক আমার দিকে চোখ মটকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না ? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন ? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।'

এই কথা বলতে-বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁটলা শুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সে পোঁটলা উঁচিয়ে দাঁত কড়মড় করে বলল, 'তবে রে ইস্টুপিড উধো !' উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুঁকো বাগিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, 'তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো !'

কাক বলল, 'লেগে যা, লেগে যা — নারদ-নারদ !'

অমনি ঝটাপট্, খটাখট্, দমাদম্, ধপাধপ্ ! মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিতপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বুধো ছট্‌ফট্ করে টাকে হাত বুলাচ্ছে।

বুধো কান্না শুরু করল, 'ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে ?'





উধো কাঁদতে লাগল, 'ওরে হায় হায় ! আমাদের বুধোর কি হল রে ?'

তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশমেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ভাবছি এই বেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কি রকম শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে-হাসতে আর কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। উঁকি মেরে দেখি, একটা জন্তু — মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না — খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, 'এই গেল গেল — নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল !'

হঠাৎ আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে, তা না হলে আর একটু হলেই হাসতে-হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।'

আমি বললাম, 'তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন ?'

জন্তুটা বলল, 'কেন হাসছি শুনবে ? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপটা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচ্-প্যাচ্ কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ্ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে — হোঃ হোঃ হোঃ হো —' এই বলে সে আবার হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, 'কি আশ্চর্য ! এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ ?'

সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, 'না, না, শুধু এর জন্য নয়। মনে কর, একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপি বরফ আর হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ, হোঃ হো, হাঃ

হাঃ হাঃ হা—' আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, 'কেন তুমি এই সব অসম্ভব কথা ভেবে খামখা হেসে-হেসে কষ্ট পাচ্ছ?'

সে বলল, 'না, না, সব কি আর অসম্ভব? মনে কর, একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—'



জন্তুটার রকম-সকম দেখে আমার অদ্ভুত লাগল। আমি জিগগেস করলাম, 'তুমি কে? তোমার নাম কি?'

সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্। আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার ভায়ের নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার বাবার নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার পিশের নাম হিজি বিজ্ বিজ্—'

আমি বললাম, 'তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিশুদ্ধ সবাই হিজি বিজ্ বিজ্।'



সে আবার খানিক ভেবে বলল, 'তাতো নয়, আমার নাম তকাই। আমার মামার নাম, তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেশোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'সত্যি বলছ? না, বানিয়ে?'

জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, 'না, না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।'

আমার ভয়ানক রাগ হল, তেড়ে বললাম, 'একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

অমনি কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত একটা দাড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিগগেস করল, 'আমার কথা হচ্ছে বুঝি?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'না' কিন্তু কিছু না-বলতেই তড়তড় করে সে বলে যেতে লাগল, 'তা তোমরা যতই তর্ক কর, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে— ছাগলে কি না খায়।' এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল—

'হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজ্ বিজ্ বিজ্। আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট দেখেই বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বি. এ. খাদ্যবিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো


S.R.

দেখতেই পাচ্ছ। ইংরাজিতে লিখবার সময় লিখি B.A. অর্থাৎ ব্যা। কোন-কোন জিনিস খাওয়া যায় আর কোনটা-কোনটা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বলো— পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়— এটা অত্যন্ত অন্যায়। এইতো একটু আগে ঐ হতভাগাটা বলছিল যে রামছাগল টিকটিকি খায়। এটা এক্কেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি অনেক রকম টিকটিকি চেটে দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিচ্ছু নেই। অবিশ্যি আমরা মাঝে-মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না, যেমন—খাবারের ঠোঙা, কিম্বা নারকেলের ছোবরা, কিম্বা খবরের কাগজ, কিম্বা সন্দেশের মতো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো বই আমরা কক্ষনো খাই না। আমরা ক্বচিৎ কখনো লেপ কম্বল কিম্বা তোশক বালিশ এসব একটু-আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিম্বা টেবিল চেয়ার খাই তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে, তখন শখ করে অনেক রকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিম্বা চেখে দেখি, যেমন, পেনসিল রবার কিম্বা বোতলের ছিপি কিম্বা শুকনো জুতো কিম্বা ক্যামবিসের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার ফুর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তাবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিম্বা শিশি বোতল, এ সব আমরা কোনোদিন খাই না। কেউ-কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে, কিন্তু সে সব নেহাত ছোটখাট বাজে সাবান। আমার ছোটভাই একটা আস্ত বার্-সোপ খেয়ে ফেলেছিল—' বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে সাবান খেয়ে ভাইটির অকালমৃত্যু হয়েছে।



হিজি বিজ্ বিজ্‌টা এতক্ষণ পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ ছাগলটার বিকট কান্না শুনে সে হাঁউ-মাঁউ করে ধড়মড়িয়ে

উঠে বিষম-টিষম খেয়ে একেবারে অস্থির! আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার! কিন্তু একটু পরেই দেখি, সে আবার তেমনি হাত-পা ছুঁড়ে ফ্যাক্-ফ্যাক্ করে হাসতে লেগেছে।
আমি বললাম, 'এর মধ্যে আবার হাসবার কি হল?'
সে বলল, 'সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে-মাঝে এমন ভয়ঙ্কর নাক ডাকাতো যে সবাই তার উপর চটা ছিল। একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে, আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমাদম মারতে লেগেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হো'—
আমি বললাম, 'যত সব বাজে কথা।' এই বলে যেই ফিরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি একটা নেড়ামাথা কে-যেন যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি-হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে আমার গা জ্বলে গেল। আমায় ফিরতে দেখেই সে আবদার করে আহ্লাদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দুহাত নেড়ে বলতে লাগল, 'না ভাই, এখন আমায় গাইতে বল না। সত্যি বলছি, আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।'
আমি বললাম, 'কি আপদ! কে তোমায় গাইতে বলছে?'
লোকটা এমন বেহায়া, সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যান্ঘ্যান্ করতে লাগল, 'রাগ করলে? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? আচ্ছা, না হয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি, রাগ করবার দরকার কি ভাই?'



আমি কিছু বলবার আগেই ছাগলটা আর হিজি বিজ্ বিজ্টা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, গান হোক, গান হোক।' অমনি নেড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত দুই তাড়া গানের কাগজ বার করে, সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুনগুন করতে-করতে হঠাৎ সরু গলায় চীৎকার করে গান ধরল—'লাল গানে নীল সুর, হাসি-হাসি গন্ধ।'
ঐ একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দুবার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল।



আমি বললাম, 'এতো ভারি উৎপাত দেখছি, গানের কি আর কোনো পদ নেই?'

নেড়া বলল, 'হ্যাঁ, আছে, কিন্তু সেটা অন্য একটা গান। সেটা হচ্ছে—অলিগলি চলি রাম, ফুটপাথে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম। সে গান আজকাল আমি গাই না। আরেকটা গান আছে—নাইনিতালের নতুন আলু—সেটা খুব নরম সুরে গাইতে হয়। সেটাও আজকাল্ গাইতে পারি না। আজকাল যেটা গাই, সেটা হচ্ছে শিখিপাখার গান।' এই বলেই সে গান ধরল—

মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশিবোতল ছিপিঢাকা সরু সরু গানে গানে
আলাভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে,
সরু মোটা শাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।

আমি বললাম, 'এ আবার গান হল নাকি? এর তো মাথামুণ্ডু কোনো মানেই হয়না।'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'হ্যাঁ, গানটা ভারি শক্ত।'

ছাগল বলল, 'শক্ত আবার কোথায়? ঐ শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তাছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না।'

নেড়াটা খুব অভিমান করে বলল, 'তা, তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো সে কথা বললেই হয়। অত কথা শোনাবার দরকার কি? আমি কি আর সহজ গান গাইতে পারি না?' এই বলে সে গান ধরল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

আমি বললাম, 'মজারু বলে কোনো একটা কথা হয় না।'

নেড়া বলল, 'কেন হবে না—আলবত হয়। সজারু কাঙ্গারু দেবদারু সব হতে পারে, মজারু কেন হবে না?'

ছাগল বলল, 'ততক্ষণ গানটা চলুক না, হয় কি না-হয় পরে দেখা যাবে।' অমনি আবার গান শুরু হল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।
আজকে হেথায় চাম্‌চিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা!
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি,
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি,
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,
দেখবে তখন ছিম্বি ছ্যাঙা চপাটি।

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে গেলাম। গান চলতে লাগল—



সজারু কয়, ঝোপের মাঝে এখনি
গিন্নী আমার ঘুম দিয়েছেন দেখনি?
জেনে রাখুন প্যাঁচা এবং প্যাঁচানী,
ভাঙলে সে ঘুম শুনে তাদের চ্যাঁচানি,
খ্যাংরা-খোঁচা করব তাদের খুঁচিয়ে—
এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।
বাদুড় বলে, পেঁচার কুটুম কুটুমী
মানবে না কেউ তোমার এসব ঘুঁতুমি।
ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আঁধারে?
গিন্নী তোমার হোঁতলা এবং হাঁদাড়ে।
তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে
চিমনি-চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাপাটে।

গানটা আরও চলত কিনা জানি না, কিন্তু এই পর্যন্ত হতেই একটা গোলমাল শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, আমার আশেপাশে চারদিকে ভিড় জমে গিয়েছে। একটা সজারু এগিয়ে বসে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছে আর একটা শাম্‌লাপরা কুমির মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে-আস্তে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে আর ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, 'কেঁদো না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

হঠাৎ একটা তকমা-আঁটা পাগড়িবাঁধা কোলাব্যাঙ রুল উঁচিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল—'মানহানির মোকদ্দমা।'

অমনি কোত্থেকে একটা কালো ঝোললা-পরা প্যাঁচা এসে সকলের সামনে একটা উঁচু পাথরের উপর বসেই চোখ বুজে ঢুলতে লাগল, আর একটা মস্ত ছুঁচো একটা বিশ্রী নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

প্যাঁচা একবার ঘোলা-ঘোলা চোখ করে চারদিক তাকিয়েই তক্ষুনি আবার চোখ বুজে বলল, 'নালিশ বাতলাও।

বলতেই কুমিরটা অনেক কষ্টে কাঁদো-কাঁদো মুখ করে চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খিমচিয়ে পাঁচ ছয় ফোঁটা জল বার করে ফেলল। তারপর সর্দিবসা মোটা গলায় বলতে লাগল, 'ধর্মাবতার হুজুর! এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেক প্রকার, যথা—মানকচু, ওলকচু, কন্দাকচু, মুখিকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু, ইত্যাদি। কচুগাছের মূলকে কচু বলে, সুতরাং বিষয়টার একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।'

এইটুকু বলতেই একটা শেয়াল শাম্‌লা মাথায় তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'হুজুর, কচু অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুটকুট করে, কচুপোড়া খাও বললে মানুষ চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুওর আর সজারু। ওয়াক্ থুঃ।' সজারুটা আবার ফ্যাৎফ্যাৎ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমির সেই প্রকাণ্ড বই দিয়ে তার মাথায় এক থাবড়া মেরে জিগগেস করল, 'দলিলপত্র সাক্ষী-টাক্ষী কিছু আছে?' সজারু ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঐ তো ওর হাতে সব দলিল রয়েছে।' বলতেই কুমিরটা ন্যাড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল—

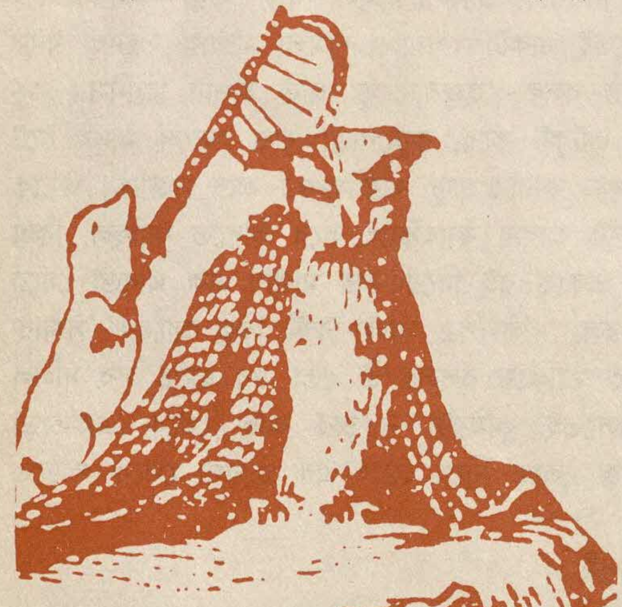


একের পিঠে দুই
চৌকি চেপে শুই

পোঁটলা বেঁধে থুই
গোলাপ চাঁপা জুঁই
ইলিশ মাগুর রুই
হিন্‌চে পালং পুঁই
সান্‌ বাঁধানো ভুঁই
গোবর জলে ধুই
কাঁদিস কেন তুই?

সজারু বলল, 'আহা ওটা কেন? ওটা তো নয়।' কুমির বলল, 'তাই নাকি? আচ্ছা, দাঁড়াও।' এই বলে সে আবার একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল—

চাঁদনি রাতের পেতনীপিসি সজনেতলায় খোঁজনা রে—
থ্যাঁতলা মাথা হ্যাংলা সেথা হাড় কচাকচ্‌ ভোজ মারে।
চালতা গাছে আল্‌তা পরা নাক ঝুলানো শাঁখচুনি
মাক্‌ড়ি নেড়ে হাঁকড়ে বলে, আমায় তো কেঁউ ডাঁকছনি!
মুণ্ডু ঝোলা উলটোবুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,
বলছে দুলে, মিনসেগুলোর মাংস খাব তুলতুলে।





সজারু বলল, 'দূর ছাই! কি যে পড়ছে তার নেই ঠিক।' কুমির বলল, 'তাহলে কোনটা, এইটা?— দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে সম্বল বোকা ভোম্বল—এটাও নয়? আচ্ছা তাহলে দাঁড়াও দেখছি— নিঝুম নিশুত রাতে, একাশুয়ে তেতালাতে,খালিখালি খিদে পায় কেন রে?— কি বললে? ওসব নয়? তোমার গিন্নীর নামে কবিতা?— তা, সে কথা আগে বললেই হত। এই তো— রাম ভজনের গিন্নীটা, বাপরে যেন সিংহীটা! বাসন নাড়ে ঝনার্ঝন, কাপড় কাচে দমাদ্দম্।—এটাও মিলছে না? তা হলে নিশ্চয় এটা—

খুসখুসে কাশি ঘুষ্ঘুষে জ্বর, ফুস্ফুসে ছ্যাদা বুড়ো তুই মর্।
মাজ্রাতে ব্যাথা পাঁজ্রাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাত!

সজারু ভয়ানক কাঁদতে লাগল, 'হায়, হায়! আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল! কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না!'

ন্যাড়াটা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল,



'কোনটা শুনতে চাও? সেই যে—বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু—সেইটে?'

অমনি শেয়াল আবার তেড়ে উঠল, 'বাদুড় কি বলে? হুজুর, তাহলে বাদুড়গোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।'

কোলাব্যাঙ গাল-গলা ফুলিয়ে হেঁকে বলল, 'বাদুড়গোপাল হাজির?'

সবাই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কোথাও বাদুড় নেই। তখন শেয়াল বলল, 'তাহলে হুজুর, ওদের সক্কলের ফাঁসির হুকুম হোক।'

কুমির বলল, 'তা কেন? আমরা আপিল করব?'

প্যাঁচা চোখ বুজে বলল, 'আপিল চলুক। সাক্ষী আনো।'

কুমির এদিক ওদিক তাকিয়ে হিজি বিজ্ বিজ্‌কে জিগগেস করল, 'সাক্ষী দিবি? চার আনা পয়সা পাবি।' পয়সার নামে হিজি বিজ্ বিজ্ তড়াক্ করে সাক্ষী দিতে উঠেই ফ্যাক্-ফ্যাক্ করে হেসে ফেলল।

শেয়াল বলল, 'হাসছ কেন?'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুই সাক্ষী দিবি যে, বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া আর মাথার উপর লালকালির ছাপ। উকিল যেই তাকে জিগগেস করেছে, তুমি আসামীকে চেন? অমনি সে বলে উঠেছে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ—হোঃ হোঃ হোঃ হো—'



শেয়াল জিগগেস করল, 'তুমি সজারুকে চেন?

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'হ্যাঁ, সজারু চিনি, কুমির চিনি, সব চিনি। সজারু গর্তে থাকে, তার গায়ে লম্বা-লম্বা কাঁটা, আর কুমিরের গায়ে চাকা-চাকা ঢিপির মতো, তারা ছাগল-টাগল ধরে খায়।' বলতেই ব্যাকরণ শিং ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কেঁদে উঠল।

আমি বললাম, 'আবার কি হলো?'

ছাগল বলল, 'আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি আধখানা মরে গেল।'

আমি বললাম, 'গেল তো গেল, আপদ গেল। তুমি এখন চুপ কর।'

শেয়াল জিগগেস করল, 'তুমি মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জান?'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'তা আর জানি নে? একজন নালিশ করে তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামী, তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে-বসে ঘুমোয়।'



প্যাঁচা বলল, 'কক্ষনো আমি ঘুমোচ্ছি না, আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।' বলেই ফ্যাক্-ফ্যাক্ করে ভয়ানক হাসতে লাগল।

শেয়াল বলল, 'আবার কি হলো?'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু—কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। হোঃ হোঃ হোঃ হো—'



শেয়াল বলল, 'বটে? তোমার নাম কি শুনি?'

সে বলল, 'এখন আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্।'

শেয়াল বলল, 'নামের আবার এখন-তখন কি?'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'তাও জানো না? সকালে আমার নাম থাকে আলুনারকোল আবার আর একটু বিকেল হলেই আমার নাম হয়ে যাবে রামতাড়ু।'

শেয়াল বলল, 'নিবাস কোথায়?'

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'কার কথা বলছ? শ্রীনিবাস? শ্রীনিবাস দেশে চলে গিয়েছে।' অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে উধো আর বুধো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে।'

উধো বলল, 'দেশে গেলেই লোকেরা সব হুস্-হুস্ করে মরে যায়।'

বুধো বলল, 'হাবুলের কাকা যেই দেশে গেল অমনি শুনি সে মরে গিয়েছে।'

শেয়াল বলল, 'আঃ, সবাই মিলে কথা বল না, ভারি গোলমাল হয়।'

শুনে উধো বুধোকে বলল, 'ফের সবাই মিলে কথা বলবি তো তোকে মারতে-মারতে সাবাড় করে ফেলব।' বুধো বলল, 'আবার যদি গোলমাল করিস তাহলে তোকে ধরে এক্কেবারে পোঁটলা-পেটা করে দেব।'

শেয়াল বলল, 'হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই।'

শুনে কুমির রেগে ল্যাজ আছড়িয়ে বলল, 'কে বলল মূল্য নেই? দস্তুরমতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।' বলেই সে তক্ষুনি ঠক্‌ঠক্ করে ষোলটা পয়সা গুণে হিজি বিজ্ বিজের হাতে দিয়ে দিল।

অমনি কে যেন ওপর থেকে বলে উঠল, '১নং সাক্ষী, নগদ হিসাব, মূল্য চার আনা।' চেয়ে দেখলাম কাক্কেশ্বর বসে-বসে হিসাব লিখছে।

শেয়াল আবার জিগগেস করল, 'তুমি এ বিষয়ে আর কিছু জানো কিনা?'

হিজি বিজ্ বিজ্ খানিক ভেবে বলল, 'শেয়ালের বিষয়ে একটা গান আছে, সেইটা জানি।'

শেয়াল বলল, 'কি গান শুনি?'

হিজি বিজ্ বিজ্ সুর করে বলতে লাগল, 'আয়, আয়, শেয়ালে বেগুন খায়, তারা তেল আর নুন কোথায় পায়—'



বলতেই শেয়াল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'থাক্-থাক্, সে অন্য শেয়ালের কথা, তোমার সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।'

এদিকে হয়েছে কি, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে সাক্ষী দেবার জন্য ভয়ানক হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কাক্কেশ্বর ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে এসে সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করেছে। কেউ কিছু জিগগেস করবার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল, 'শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ। শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে, ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি। আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী





খুচরা পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য—'
শেয়াল বলল, 'বাজে কথা বল না, যা জিগগেস করছি তার জবাব দাও। কি নাম তোমার?'
কাক বলল, 'কি আপদ! তাই তো বলছিলাম— শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে।'
শেয়াল বলল, 'নিবাস কোথায়?'
কাক বলল, 'বললাম যে কাগেয়াপটি।'
শেয়াল বলল, 'সে এখান থেকে কতদূর?'
কাক বলল, 'তা বলা ভারী শক্ত। ঘন্টা হিসেবে চার আনা, মাইল হিসাবে দশ পয়সা, নগদ দিলে দুই পয়সা কম। যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা।'
শেয়াল বলল, 'আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। জিগগেস করি, তোমার বাড়ি যাবার পথটা চেন তো?'
কাক বলল, 'তা আর চিনিনে? এইতো সামনেই সোজা পথ দেখা যাচ্ছে।'
শেয়াল বলল, 'এ-পথ কতদূর গিয়েছে?'
কাক বলল, 'পথ আবার যাবে কোথায়? যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি আবার এদিক ওদিক চরে বেড়ায়? না, দার্জিলিঙে হাওয়া খেতে যায়?
শেয়াল বলল, 'তুমি তো ভারি বেয়াদব হে! বলি, সাক্ষী দিতে যে এয়েছ, মোকদ্দমার কথা কি জান?'
কাক বলল, 'খুব যা হোক! এতক্ষণ বসে-বসে হিসেব করল কে? যা কিছু জানতে চাও আমার কাছে পাবে। এই তো, প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে কচুরি। কচুরি চার প্রকার—হিঙে কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি আর জিবেগজা! খেলে কি হয়? খেলে শেয়ালদের গলা কুটকুট করে, কিন্তু কাগেদের করে না। তারপর একজন সাক্ষী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত, তার কানের চামড়া নীল



হয়ে গেল— তাকে বলে কালাজ্বর। তারপর একজন লোক ছিল সে সকলের নামকরণ করত—শেয়ালকে বলতো তেলচোর, কুমিরকে বলতো অষ্টাবক্র, প্যাঁচাকে বলতো বিভীষণ—' বলতেই বিচার সভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাৎ খেপে গিয়ে টপ্ করে কোলাব্যাঙকে খেয়ে ফেলল, তাই দেখে ছুঁচোটা কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্ করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল, শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হুস-হুস করে কাক্কেশ্বর কুচ্কুচেকে তাড়াতে লাগল।

প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সবাই চুপ কর, আমি মোকদ্দমার



রায় দেব।' এই বলেই সে একটা কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হুকুম করল, 'যা বলছি লিখে নাও: মানহানির মোকদ্দমা, চব্বিশ নম্বর। ফরিয়াদী—সজারু। আসামী—দাঁড়াও। আসামী কৈ?' তখন সবাই বলল, 'ঐ যা! আসামী তো কেউ নেই।' তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে ন্যাড়াকে আসামী দাঁড় করানো হল। ন্যাড়াটা বোকা, সে ভাবল আসামীরাও বুঝি পয়সা পাবে, তাই সে কোনো আপত্তি করল না।

হুকুম হল—ন্যাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এ-রকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ 'ব্যা-করণ শিং' বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কি রকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, 'ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে-পড়ে ঘুমানো হচ্ছে?'

আমি তো অবাক! প্রথমে ভাবলাম বুঝি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না, আমার রুমালটা খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও রুমাল নেই, আর একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়েই খচ্‌মচ্ করে নেমে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে বাগানের পিছন থেকে একটা ছাগল ব্যা করে ডেকে উঠল।

আমি বড়মামার কাছে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, 'যা, যা, কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গল্প করতে এসেছে।' মানুষের বয়স হলে এমন হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনও বেশি বয়স হয়নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।

গ্রন্থপরিচয়

'হযবরল'—ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল 'সন্দেশ'-এর ১৩২৯-এর জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র, এই চার সংখ্যায়। তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। প্রকাশক, ইউ.রায় অ্যাণ্ড সন্‌স। প্রকাশকাল, ১৯২৪, ২২ সেপ্টেম্বর। পরে সম্পূর্ণ নতুন ফরম্যাটে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করেন সিগনেট প্রেস। প্রকাশকাল, ১৯৪৫, ৩ ডিসেম্বর।

দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকার পর, প্রায় বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া থেকে, সিগনেট প্রেস কি ভাবে সুকুমারের বইগুলি একে একে ছেপে বের করলেন, সে কাহিনী আমরা জেনেছি সত্যজিৎ রায়ের সিগনেট প্রেসের কর্ণধার ডি. কে. গুপ্ত সম্পর্কে লেখা একটি রচনা থেকে। "দিলীপ গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন,'আবোল তাবোল হযবরল-র কী অবস্থা?' জানালাম সেগুলো এখনও ছাপা হয় এবং বিক্রি হয়, তবে প্রকাশক আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেন নি। 'পয়সা দেয়?' প্রশ্ন করলেন দিলীপ গুপ্ত। জানাতে হলো আজ পর্যন্ত ওই দুখানা এবং উপেন্দ্র কিশোরের কোনো বই থেকে কোনো অর্থাগম হয় নি। ...আমি কাজে যোগ দেবার বছর খানেকের মধ্যেই ডি কে .সিগনেট প্রেসের পত্তন করেন। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার আর অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য নিয়েই কাজ শুরু।"



সত্যজিৎ রায়ের কাজে যোগ দেওয়ার মানে ডি জে কীমার নামের তখনকার সবচেয়ে নামডাকওয়ালা অ্যাডভারটাইজিং কোম্পানীর জুনিয়র ভিস্যুয়ালাইজার হওয়া। ডি কে গুপ্ত তখন ঐ কোম্পানীর অন্যতম কর্মকর্তা। সদ্যগঠিত সিগনেট প্রেস থেকে প্রথম বেরোয় 'বহুরূপী' আর 'ঝালাপালা', ১৯৪৪-এ। পরের বছর 'আবোল তাবোল' আর 'হযবরল'। পরের বছর 'পাগলা দাশু'। ১৯৫০-এ 'খাই খাই'। ১৯৫৬-এ 'বর্ণমালাতত্ত্ব' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ'।

পরিজন পরিচিতি

লোকনাথ রায়

প্রপিতামহ। রূপ, গুণ, পাণ্ডিত্য, প্রতিভায় গড়া মানুষ। জরীপের কাজে দক্ষ। গণিতে পারদর্শী। বাবার অনুরোধে চাকরি নিয়েছিলেন ইংরেজ কোম্পানির অধীনে কয়েকটা জমিদারির জরিপের কাজ। কোনো এক পক্ষের ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাবে নারাজ হয়ে চাকরি থেকে তৎক্ষণাৎ ইস্তফা। তন্ত্র সাধনায় অনুরাগ অল্প বয়স থেকেই। চাকরি ছাড়ার পর ডুবে রইলেন তন্ত্রে-মন্ত্রে। পাছে সংসার ছেড়ে চলে যায় বনে-পাহাড়ে, সেই ভয়ে জোর করেই বিয়ে দিয়ে দিলেন বাবা রামকান্ত। মেয়ের নাম কৃষ্ণমণি। তাতেও কোনো লাভ হল না দেখে রামকান্ত রেগে গিয়ে ছেলের উপাসনার ডামর গ্রন্থ, নরকপাল, মহাশঙ্খের মালা ইত্যাদি ফেলে দিলেন ব্রহ্মপুত্রের জলে। মনের দুঃখে শর্য্যা নিলেন লোকনাথ। তিন দিনের দিনই ঘটল তাঁর ইচ্ছামৃত্যু। বয়স তখন মোটে বত্রিশ। কৃষ্ণমণির কোলে রইল কেবল তাঁর শিশুপুত্র। পরে তার নামকরণ হয় কালীনাথ।



কালীনাথ রায়

পিতামহ। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ভাষায় পণ্ডিত। এই তিন ভাষার যে কোনো একটা ভাষার রচনা থেকে অনুবাদ করে যেতে পারতেন গড়গড়িয়ে। শাস্ত্রবিচারে তাঁকে মধ্যস্থ মানতেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা। আবার ফরমানের মানে বুঝে নিতে ছুটে আসত মৌলবীরাও। লোকে তাকে ডাকতো শ্যামসুন্দর মুন্সী বলে। বলিষ্ঠ দেহের মানুষ। কিন্তু বাঁচেন নি বেশিদিন। স্ত্রী জয়তারার গর্ভে জন্ম নেয় এই শ্যামসুন্দরের পাঁচ ছেলে আর তিন মেয়ে। মেয়ে তিনজন হলেন, গিরিবালা, ষোড়শী আর মৃণালিনী। ছেলেরা হলেন সারদারঞ্জন, কামদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, আর প্রমদারঞ্জন। দ্বিতীয় ছেলে কামদারঞ্জনকে দত্তক নিয়েছিলেন দূর সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী।

তখনই তাঁর নামকরণ হয় উপেন্দ্রকিশোর।



উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাবা। জন্ম, ১৮৬৩। জন্মস্থান, মৈমনসিংহের মসুয়া গ্রামে। যখন জেলা স্কুলের ছাত্র, সহপাঠী গগনচন্দ্র হোমের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট। ১৮৮০। প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৮৪। বি.এ. পাশ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে। ঐ বছরেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান আর বিয়ে। বয়স তেইশ। স্ত্রীর নাম বিধুমুখী। দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। দ্বারকানাথ তখন ব্রাহ্মসমাজের নেতা। সমাজসংস্কারক। তেজস্বী মানুষ। জাত-ধর্ম-খোয়ানো এ বিয়েতে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অসন্তোষ। তবে তা প্রকট হয়ে ওঠেনি কখনো, পারিবারিক সৌহার্দ্যের টানে। বিয়ের কিছুদিন পরে সস্ত্রীক উঠে এলেন ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের প্রকাণ্ড লাল বাড়িতে। সেখানে তখন আরো বহু ব্রাহ্ম পরিবারের বসবাস। আর থাকতেন তাঁর শ্বশুর মশাই। নীচে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়। আর তার বোর্ডিং। ঐ বাড়ির ছাতেই হতো বালক-বালিকাদের সম্মেলন প্রত্যেক বছর ভাদ্রোৎসবে আর মাঘোৎসবে।

১৮৮৩। প্রথম লেখা 'সখা'-য়। এর পর থেকে নিয়মিত লিখতেন নানা কাগজে, নানা বিষয়ে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, রূপকথা ছাড়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীও। কখনো গদ্যে কখনো পদ্য ছন্দে। বইও বেরল একাধিক। লেখা ছাড়াও আরো দুটো বড় নেশা, ছবি আঁকা আর গান-বাজনা। ছবি আঁকার দিকে টান ছোটবেলা থেকেই। জলরঙ, তেলরঙ, কালি-কলমের ড্রইং, সবই শিখেছিলেন ব্যক্তিগত অধ্যবসায়ে। নিজের বইয়ের ছবি ছাড়াও ছবি এঁকেছেন সীতা দেবী শান্তা দেবীর লেখা 'হিন্দুস্থানী রূপকথা'-র। সাতটা সাদা কালো ছবি রবীন্দ্রনাথের 'নদী' অবলম্বনে। ছবি এঁকেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সচিত্র সপ্তকাণ্ড'-এর রামায়ণ,সীতা দেবীর 'নিরেট গুরুর কাহিনী'-র। গান বাজনার সূত্রেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বাজাতে জানতেন বহু রকমের বাজনা। তবে সবার প্রিয় ছিল বেহালা। বই-ও লিখেছেন বাজনা-শেখানোর, 'হারমোনিয়াম শিক্ষা'। যুক্ত ছিলেন 'ডোয়ার্কিন অ্যান্ড কোং'-এর 'সংগীত-প্রকাশিকা'-র সঙ্গেও। তাঁর লেখা 'জাগো পুরবাসী' ব্রহ্মসঙ্গীত এখনো গাওয়া হয় মাঘোৎসবে। 'সাধনা', আর 'প্রবাসী'-র পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক নানা প্রবন্ধ, ছিল ফটোগ্রাফিতেও আগ্রহ। নিজের লেখার সঙ্গেও ব্যবহার করতেন নিজের তোলা ফটোগ্রাফ। ছোটদের জন্যে তাঁর প্রথম বই 'সেকালের কথা'। যদিও এর আগেই ছাপা হয়েছিল 'ছোটদের রামায়ণ'। দ্বিতীয় সংস্করণে বইটি ছবিতে ও পৃষ্ঠাসংখ্যায় এত বদলে যায় যে স্বয়ং লেখকই জানিয়েছিলেন, 'প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একটি নতুন পুস্তক'। তাঁর অন্যান্য বই : ছেলেদের

মহাভারত, মহাভারতের কথা, টুনটুনির বই, ছোট্ট রামায়ণ। ১৯১৩। বের করলেন ছোটদের জন্যে মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ'। বাংলা শিশু সাহিত্যে যুগান্তর আনল এই পত্রিকা। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই হয়ে উঠলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের অবিসংবাদী নেতা। এসব ছাড়িয়ে তাঁর ভিতরে কাজ করত এক বৈজ্ঞানিক-মন। বৈজ্ঞানিক উপেন্দ্রকিশোরের সে-পরিচয় আমাদের এখন ততখানি জানা নয়। ১৩০৯-এ ছবি ছাপার জগতে একটা বিপ্লব ঘটালেন তিনি নিজের সৃজনী শক্তিতে 'রে-টিন্ট'পদ্ধতি আবিষ্কার করে। পরে পরে 'রে-টাইপ', 'ডুয়োটাইপ', 'থ্রি কালার' ইত্যাদি পদ্ধতিও তাঁর ব্যক্তিগত। ১৮৯৫। ১৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে উঠে এসেই শুরু করেন হাফটোন ব্লক তৈরির ব্যবসা। তখন নাম ছিল ইউ.রায় আর্টিস্ট। ১৯১০-এ নাম নাম পালটে হল ইউ.রায় অ্যাণ্ড সন্স। প্রসেস ব্লকে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তখনকার বিখ্যাত দুই পত্রিকা, 'প্রবাসী' এবং'মডার্ন রিভিউ'। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-র প্রথম সংস্করণ ছেপেছিলেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সে বইয়ে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির সংখ্যা ছিল ২৪। সে সব ছবিকে হাফটোন ব্লকে রূপান্তরিত করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোরই। পেনরোজ অ্যানুয়েলে ছাপা হল তাঁর তিনটে মৌলিক গবেষণামূলক রচনা, ১৮৯৭ থেকে ৯৯-এর মধ্যে। পরে আরো একাধিক। প্রসেস শিল্প সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা ও হাতে-কলমে কাজ তখন ইওরোপের কাছেও .বিস্ময়কর। উপেন্দ্রকিশোরের তিন ছেলে আর তিন মেয়ে। সুখলতা, সুকুমার, পুণ্যলতা, সুবিনয়, শান্তিলতা, সুবিমল। এদের ডাকনাম যথাক্রমে হাসি, তাতা, খুসী, মণি, 'টুনি, নানকু। প্রথম দুটো ডাক নাম রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি থেকে খুঁটে-নেওয়া।

মৃত্যু, ১৯৫৫



বিধুমুখী রায়চৌধুরী

মা। এঁর সম্বন্ধে বিশদ জানা যায় না কিছু। মেয়ে পুণ্যলতার 'ছেলেবেলার দিনগুলি'-তে রয়েছে ছড়ানো-ছিটোনো কিছু কথাবার্তা।

১। "বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন, ছবি আঁকছেন। মা সেলাই করছেন। আমরা খেতে বসেছি, মা পরিবেশন করছেন।"

২। "মায়ের একটা সুন্দর বাক্স ছিল, সেটা খুললেই আমরা চারদিক থেকে ঝুঁকে পড়তাম। বাক্সটার গায়ে অনেক কারিকুরি করা, ডালার ভিতরে আয়না বসানো, আর নানা রকম খোপ কাটা। সেই সব খোপে কত আশ্চর্য সব জিনিস। লেসের মত ফুরফুরে জালি-কাটা হাতির দাঁতের পাখা, ঝিনুকের (mother of Pearl)তৈরি ছোট্ট ব্যাগ, তার মধ্যে দেশ-বিদেশের কতকালের পুরানো সব টাকা পয়সা। মিনা করা, তারের কাজ করা, চন্দন কাঠের খোদাই করা, টুকিটাকি কত সুন্দর সুন্দর জিনিস—আমাদের কাছে সে-সব যেন

গুপ্তরত্নের ভান্ডার মনে হত।"



৩। "শুধু নিজের পরিবারেই নয়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শী, যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসত, সকলকেই তিনি সহজে আপনার করে নিতেন। মাকে দেখতাম সারাদিন কাজে ব্যস্ত—যেন তাঁর নিজের আরাম বা বিশ্রাম বলে কিছু নেই। বাড়ির সমস্ত কাজ দেখাশোনা করা, সকলের সেবাযত্ন করা, বাইরের সকলের খোঁজখবর নেওয়া, কার অসুখ, কার কি অভাব, কার কিসে সাহায্য দরকার, সব দিকেই তাঁর খেয়াল থাকত। কতবার দেখেছি, কারো হয়তো অসুখ, কিছু খেতে পারছে না শুনে মা নানারকম সহজ সুস্বাদু খাবার নিজের হাতে তৈরী করে পাল্কি করে নিয়ে গিয়ে সামনে বসে খাইয়ে এসেছেন।... আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করত, মা তাদের পরিবারের লোকের মতই স্নেহ যত্ন করতেন।"

সারদারঞ্জন রায়

জ্যাঠামশাই। জন্ম, ১২৬৫। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পাশ। ছোটবেলা থেকেই ব্যায়াম আর ক্রিকেট চর্চা। ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে এম. এ পড়তে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। গণিতে অসাধারণ দক্ষতা দেখে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার মিঃ ন্যাস তাঁকে জোর করে এম. এ পরীক্ষা দেওয়ালেন প্রেসিডেন্সীর ছাত্র হিসেবে। কিছুদিন আলিগড় এম. এ. ও কলেজে গণিতের অধ্যাপক। পরে বহরমপুর ঢাকা ইত্যাদি আরো নানা কলেজে। ১৯০৯ থেকে আমৃত্যু কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ। গণিত বিষয়ে লিখেছেন একাধিক বই। ব্যাখ্যা করেছেন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের। মৃত্যুর পরে ছেপে বেরিয়েছে তাঁর পাণিনির ব্যাকরণের ইংরেজি অনুবাদ। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ তৈরি হয় না শুধু পড়ার ক্লাসে। মানুষ তৈরির কাজে খেলার মাঠও অনেকখানি দরকারি। নিজে নামজাদা ক্রিকেটার। বাংলা ক্রিকেটের জনকও বলা হয় তাঁকে। সাহেবরা ইংলণ্ডের নামজাদা ক্রিকেটার ডব্লিউ. জি. গ্রেস-এর নামে তাঁর নামকরণ করেছিলেন ডব্লিউ. জি. অব ইন্ডিয়া। তাঁর লম্বা-চওড়া দাড়িসহ চেহারাটা সাড়া তুলতো খেলার মাঠে। তাঁর ছিল নিজস্ব দোকানও। যেমন খেলার সরঞ্জামের, তেমনি বই-পত্তরের। পুণ্যলতার স্মৃতিচারণায় আরো সব সব মজার খবর। পড়াশোনায় মন ছিল না মোটেও। ছেলেবেলার দিনগুলো কাটত গাছে চড়ে, সাঁতার কেটে আর খেলাধুলোয়। মিষ্টি খেতে ভালোবাসতেন খুব। এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্যে পড়তে এলেন যখন ময়মনসিংহের স্কুলে, তখন রোজ বিকেলের জলখাবার ছিল পাঁচ পো পান্তুয়া। তার ফলে অসুখ। পড়াশোনা বন্ধ। পাশ করার আশা নেই এক তিল। তবুও যে পাশ করলেন বৃত্তি পেয়ে, তার পিছনে অলৌকিক এক স্বপ্ন। পরীক্ষায় কি কি প্রশ্ন আসবে, সব নাকি জেনে গিয়েছিলেন স্বপ্নে।

"জ্যেঠামশায়ের বাড়িতে গেলে চারদিকে দেখতাম ক্রিকেট ব্যাট, হকিস্টিক, মুগুর, ডাম্বেল, মাছ ধরার ছিপ। কাকারাও সকলে ব্যায়াম করতেন। সকলেই ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। বাড়ির একটু বড় ছেলেদের জ্যেঠামশাই নিয়মমত ব্যায়াম করাতেন এবং খেলা শেখাতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বড় হয়ে খেলায় খুব নাম করেছে। বাড়ির চাকরদের তিনি কুস্তী শেখাতেন আর গায়ে জোর হবার জন্যে তাদের হালুয়া খাওয়াতেন। প্রতিদিন তিনি হেঁটে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন, স্নান সেরে ভিজে কাপড় গামছায় বেঁধে নিজের হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতেন।

ছিপে মাছ ধরারও তাঁর খুব শখ ছিল। ছুটির দিনে কাকাদের সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে যেতেন। যেদিন বড় বড় মাছ পাওয়া যেত, বাড়ি বাড়ি ভাগ করে পাঠানো আর নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর ধুম পড়ে যেত।

ভাইফোঁটার দিন সকালে আমরা সমস্ত ভাইবোনেরা জ্যেঠামশায়ের বাড়িতে জড়ো হতাম। সেদিন আর দোকানের সন্দেশ রসগোল্লা নয়, থালাভরা পিঠে-পুলি, লাড়ু, তক্তি, ছাঁচ তার ঠিক নেই।"

লীলা মজুমদারের স্মৃতিচারণায় আরেক রকম ছবি। "আমার বড় জ্যাঠামশাই বলতেন, 'compromise আবার কি ? অন্যায়ের সঙ্গে কখনো compromise হয় না; অন্যায় সর্বদা অন্যায়।' কাজের বেলাও তাই। প্রথম সরকারী কলেজে চাকরিতে ঢুকেছেন। একাধারে পণ্ডিত ও খেলোয়াড়, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা, তখনি গোল বাধল। ইংরেজ প্রিন্সিপাল আদেশ করলেন, একটা বিশেষ ম্যাচে কলেজের ক্রিকেট টিমে নামতে হবে। বড় জ্যাঠামশাই তো অবাক— 'ও তো ছাত্রদের টিম, অন্য কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে খেলা হবে, তাতে আমি কি করে খেলি ?' সাহেব বলল, 'কেউ টের পাবে না, আমরা জিতে যাব। আমি আদেশ করছি।' শুনে বড় জ্যাঠামশায়ের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন, 'এমন অন্যায় আদেশ আমি মানি না।' ব্যস, অমন ভালো চাকরি তখুনি ছেড়ে দিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কখনো ইংরেজ সরকারের চাকরি করবেন না। করেনও নি। এমন মানুষকে যে বিদ্যাসাগর মশাই খুঁজে পেতে তাঁর কলেজে ঢোকাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি ?"

মৃত্যু।



মুক্তিদারঞ্জন রায়

কাকা। আরো ঘনিষ্ঠ নাম, সুন্দরকাকা। তিনিও ছিলেন তখনকার মেট্রোপলিটান আর এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। আর দাদার মতই ক্রিকেট খেলোয়াড়। পুণ্যলতা জানান— "সুন্দর কাকার গায়ে যে অসাধারণ জোর ছিল, তাঁর চেহারা দেখে তা বোঝা যেত না। ঠাণ্ডা মানুষ, ধীরে কথা বলেন, মৃদু হাসেন। পুরনো দিনের অনেক গল্পই তাঁর কাছে শুনেছিলাম আর শুনেছিলাম তাঁর নিজের ছোটবেলার দুষ্টুমী ও দুরন্তপনার গল্প। সে গল্প বলবার সময়ে



তাঁর মিষ্টি হাসির মধ্যে সেই দুষ্টু ছেলেটাকে তখনও চেনা যেত।" খেলার মাঠে গোরা সেপাইদের কাছেও তিনি জুজু। তিনি বল নিয়ে এগোচ্ছেন সুকৌশলে। একজন গোরা সেপাই আরেক জনকে বললে ফিসফিসিয়ে— 'নক্ দ্যাট বিয়ার্ডেড ফেলো ডাউন'। তখন সেই আরেকজনের উত্তর— 'নট সো ইজি'। অমন শক্তিমান মানুষ কিন্তু সব সময়েই চুপচাপ। মন-খারাপ সারানোর মজার ওষুধ ছিল তাঁর, অঙ্ক কষা। অঙ্কে অসাধারণ পারদর্শিতা। একবার একটা মৌলিক গবেষণা পাঠিয়েছিলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত এক গণিতশাস্ত্রবিদ্‌কে। পরে দেখা গেল সাহেবের বইয়ের নতুন সংস্করণে ঋণ-স্বীকার না করেই ছেপে দেওয়া হয়েছে তাঁর সিদ্ধান্ত।

কুলদারঞ্জন রায়

ধন কাকা। তিনিও দাদাদের মতই ক্রিকেটার । আবার হকিতেও দক্ষ। তাছাড়া আরো একাধিক তাঁর পরিচয়। সঙ্গীতজ্ঞ, আলোকচিত্রশিল্পী, আর সবার উপরে শিশু সাহিত্যিক। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েই ভর্তি হয়েছিলেন, আর্ট স্কুলে। ছবি তেমন আঁকেন নি। তবে ঐ অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল ফটোগ্রাফী রং করার বা এনলার্জ করার কাজে। দাদা উপেন্দ্রকিশোরের উৎসাহেই 'সন্দেশ'-এ লেখালিখির শুরু। তাঁর লেখা বই-এর নাম ঃ 'রবীনহুড', 'ওডিসিয়ুস', 'ছোটদের বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কথাসরিৎসাগর', 'পুরাণের গল্প', 'ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'অজ্ঞাত জগৎ', 'বাস্কারভিল কুকুর'। অনুবাদও করেছেন অন্যভাষার শিশু সাহিত্য থেকে।

স্ত্রীবিয়োগের পর শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়ি থেকে তিনি উঠে আসেন উপেন্দ্রকিশোরের ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। উপেন্দ্রকিশোর তখন প্রসেস-এর কাজে বেশি মনোযোগী। ফলে ফটোগ্রাফীর কাজটা দেখা শোনা করতেন কুলদারঞ্জন। বিজ্ঞাপন দিয়েও জানানো হয়েছিল যে 'হাই ক্লাস অয়েল পেনটিং' আর 'ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট' চাইলে 'কে রায় আর্টিস্ট'-এর সঙ্গে যোগাযোগের কথা। তখনকার কলকাতায় তাঁর বাজারি পরিচয়, নামজাদা 'ফটো-আর্টিস্ট'। ১৯০৬-এ কলকাতায় উদ্বোধন হয় 'ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল একজিবিশন'। কুলদারঞ্জন সে-প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছিলেন 'ফটোগ্রাফ' বিভাগে ব্রোমাইড-পেনটিং-এ অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে। পুণ্যলতা জানান, তখনকার সময়ে কলকাতায় এমন সম্ভ্রান্ত পরিবার খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে নেই কুলদারঞ্জনের তৈরি করা প্রিয়জনের ছবি।

লীলা মজুমদারের স্মৃতিচারণায় এই মানুষটির ঘরোয়া ছবি— "ছোট জ্যাঠামশাই অর্থাৎ কুলদারঞ্জনের ভাত খাওয়ার পর্বটি ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক। তিনি যখন স্নান করতে যাবেন, তখন তাঁর ভাত চাপাতে হবে, তার আগে নয়। ভাত হবে মোটা সিদ্ধচালের, অন্যান্যদের জন্যে যে সরু আতপ রান্না হত তা



তিনি খেতেন না। বেশ শক্ত ঝরঝরে ভাত হবে। যাতে একটু উঁচু থেকে কাঁসার থালার উপর ফেললে চুন্ চুন্ শব্দ হয়। চাও খেতেন অন্যদের চেয়ে একটু অন্যরকম। নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। বলা বাহুল্য, মসূয়ার কুলদারঞ্জনের গায়ের রঙটি মোটেই ফর্সা ছিল না; যদিও তাঁর বাবার শুনেছি দুধে-আলতা রঙ ছিল।"

প্রমদারঞ্জন রায়

ছোট কাকা। বিখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদার এঁরই মেয়ে। অন্য ভায়েদের মত ইনিও খেলোয়াড়। ভারত সরকারের বনবিভাগে চাকরি। তখনকার শ্যাম আর বার্মা মুলুকের মত দুর্গম সব অঞ্চলে তাঁর কাজ। ফলে বেশিদিন খেলতে পারেন নি। কিন্তু ক্রিকেট খেলার ক্ষতচিহ্নগুলো খোদাই করা ছিল সর্বাঙ্গে। পুণ্যলতার দেওয়া বিবরণে সামনের দুটো দাঁত ভাঙা, হাতের দুটো আঙুল ভাঙা, কলার বোন ভাঙা, এবং হাঁটুও। অথচ এই মানুষই প্রাণখোলা হাসিতে ভরপুর। বিদেশ থেকে বাড়িতে এলে তাঁর হাহা হাহা হাসিতে গোটা বাড়িটাই থরোথরো। মুখে গল্প বলে শোনাতে পারতেন চমৎকার। পুণ্যলতারা তাঁদের ছেলেবয়সে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছেন 'থ্রী মাসকেটিয়ার্স', 'এল্যান কোয়াটারম্যান', 'কিং সলোমনস মাইনস', 'এরিক ব্রাইট আইজ' ইত্যাদির গল্প। মেয়ে লীলারও প্রায় একই অভিজ্ঞতা।

"বাবাকে আমরা দারুণ ভয় করতাম, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মুগ্ধ করবার মন্ত্রও তাঁর জানা ছিল। অদ্ভুত গল্প বলবার ক্ষমতা ছিল তাঁর; সে সব গল্পের তুলনা নেই, দেশ বিদেশের গল্প, নিজের বন-জঙ্গলের অভিজ্ঞতার গল্প, পূর্ব-বাংলায় তাঁর ছোটবেলাকার গল্প। শুনে শুনে আমাদেরও চোখের সামনে ভেসে উঠতো আম-কাঁঠালের বনে ছাওয়া, জল থৈ থৈ-করা দীঘি পুকুরে শীতল-করা আমাদের গাঁয়ের ছবি।"

বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে শোনানো এই সব গল্পই একদিন 'সন্দেশ'-এ বেরতে লাগল 'বনের খবর' নামে। ঐ একখানা বই লিখে তিনিও বাংলা শিশু সাহিত্যে স্থায়ী করে রেখে গেলেন নিজের নাম।

হেমেন্দ্রমোহন বসু

ছোট পিসেমশাই। উপেন্দ্রকিশোরের ছোট বোন মৃণালিনী দেবীর স্বামী। আনন্দমোহন বসুর ভাইপো। এইচ. বোস নামে বিখ্যাত। তখনকার কাগজে ছড়ার ছন্দে বেরত একটা বিজ্ঞাপন।

কেশে মাখো কুন্তলীন
রুমালেতে দেলখোশ
পানে খাও তাম্বুলীন
ধন্য হোক এইচ বোস।

পারফিউম বা গন্ধদ্রব্যের ব্যবসা ছিল তাঁর। নিজের বাড়িতেই ল্যাবরেটরী। সেখানেই তাঁর নানা রকম সুগন্ধী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নিজের চোখে দেখা ছবি পুণ্যলুতার স্মৃতিচারণায়—

"ঘরটার দিকে গেলেই সুগন্ধ ভুরভুর করত। কত রকমারি শিশি বোতল, রাশি রাশি ফুল, চোলাই করবার যন্ত্র, বড় বড় পাথরের খল ও হামানদিস্তা; এক কোণে একটা সোডা তৈরির কল, সে রকম আমরা আগে কখনো দেখিনি, হাতল টিপলেই ভুস ভুস করে নল দিয়ে সোডা-ওয়াটার বেরোত, সিরাপ মিশিয়ে আমাদের খেতে দিতেন। রুমাল জামায় সুগন্ধ এসেন্স দিয়ে দিতেন।"

দিলখোশ মানুষ। আমোদে-আহ্লাদে সর্বক্ষণ আটখানা হয়ে থাকাতেই তাঁর আসল সুখ। আর এক সুখ, শখ মিটিয়ে। শখটা অবশ্য এক রকমের নয়। হরেক। গান বাজনার শখ। ফটোগ্রাফীর শখ। গাড়ি কেনার শখ। ফিল্মের ব্যাপারে শখ। ফনোগ্রাফ বাজানোর শখ। কলকাতায় প্রথম যারা ফোর্ড গাড়ি কেনে হেমেন্দ্রমোহন তাঁদের একজন। আর যে সময়ের কথা তখন কলকাতার মোটর গাড়ির সংখ্যা আঙুলে গোনার মত। প্রথম যাঁরা মানুষের কণ্ঠস্বর রেকর্ডিং করার দিকে মনযোগী হন, তাঁদেরও একজন তিনি। নিজে রেকর্ড করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গান 'বন্দেমাতরম্'। লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন যে, সেকালের ঐ সিলিণ্ড্রিক্যাল রেকর্ড বাজানোর যন্ত্র এখন যদিও দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু হেমেন্দ্রমোহনের নিজের হাতে গড়া সে-রেকর্ডটি নাকি অটুট রয়েছে এখনো। আর রেকর্ডিং করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গাওয়া হাসির গান। সেই সঙ্গে রেকর্ডিং করেছিলেন প্রমদারঞ্জন রায়ের অতুলনীয় হাসি। ফিল্মের ব্যাপারেও সমান উৎসাহ। বাড়িতেই ছিল প্রজেক্টর। বাড়ির বা পরিবারের ছেলে মেয়েরা বায়স্কোপ দেখতো তাঁর বাড়িতে বসেই। গ্রামাফোন রেকর্ডের ব্যবসাটা করেছিলেন এক ফরাসি কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে। ১৯০৬-এর 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রদর্শনী'তে ছিল হেমেন্দ্রমোহনের স্টল। একাধিক স্বর্ণপদকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন নিজের আবিষ্কারের জন্যে। তার মধ্যে সেরা পুরস্কারটা মিলেছিল বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর হাত থেকে, ফোনোগ্রাফিক সিলিণ্ডার-এর জন্যে।



ছেলেমেয়ের সংখ্যা চোদ্দ। তাদের মধ্যে অনেকেই নামজাদা। যেমন মেয়ে মালতী ঘোষাল, রবীন্দ্রসংগীতের আদি যুগের গায়িকা। এখনো সে-কণ্ঠস্বর, পুরনো ঘষা রেকর্ডেও, মাতিয়ে দেয়। ছোট ছেলে হিতেন আর্টিস্ট, গানের গুণগ্রাহী, ফারসী জানা, দুর্মূল্য বইপত্রের সংগ্রাহক। আরেক ছেলে নীতিন বসু তো নামজাদা চিত্রপরিচালক। আরেক ছেলে মুকুল, সিনেমা জগতের খ্যাতনামা সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট। অন্য সব ভাইয়েদের মধ্যে ক্রিকেটে নামকরা দুজন হলেন কার্তিক বসু আর গণেশ বসু।



দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মাতামহ৷বিক্রমপুরের মাগুরখণ্ডগ্রামে জন্ম। বাবা কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় থাকতেন ফরিদপুরে বিষয়-আশয় সংক্রান্ত ব্যাপারে। গ্রামের পাঠশালায় পড়তে পড়তেই ইংরেজি শেখার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠলে দ্বারকানাথকেও নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় আবার ফিরে আসতে হয় গ্রামে। কাছাকাছি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়েও পাশ করতে পারলেন না প্রবেশিকা। এখানে ওখানে স্কুল মাস্টারি করতে করতে শেষ পর্যন্ত লোনসিং গ্রামে। বয়স তখন ১৭। এই সময় এক কুলীন-কন্যার হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে শুধু বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনেই উৎসাহী হলেন না তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই বের করলেন, 'অবলাবান্ধব' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকাও। সমাজের যাবতীয় কুপ্রথা আর অসহায় নারী সমাজের উপর উৎপীড়ন, এই দুয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে উঠল সে কাগজ। দূর মফঃস্বল থেকে এ রকম কাগজ কেউ বের করতে পারে, তা ভেবে কলকাতার সমাজ-নায়কেরাও বিস্মিত। তিনি তখন তাঁদের কাছে 'হীরো'। ১৮৭০-এ অবলাবান্ধব-সহ কলকাতায় চলে এলেন তিনি ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারকদের আহ্বানে । তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' আর ছাত্রীনিবাস-এর প্রতিষ্ঠা। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও তিনি। 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' উঠে গেলে গড়লেন 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়'। কয়েক বছর পরে সেটা মিশে যায় বেথুন কলেজের সঙ্গে। এরপর জড়িয়ে পড়লেন কলকাতার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে। হলেন নবগঠিত 'ভারতসভা-র' সহকারী সম্পাদক। কিছুদিন কেশবচন্দ্র সেনের দলে থাকলেও 'কুচবিহার বিবাহে'-র ডামাডোলের সময় সেখান থেকে সরে এসে উদ্যোগী হন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গঠনে। এর আগেই হয়েছেন 'সমালোচক' পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৩০-এ, প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিয়ে করলেন প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট কাদম্বিনী বসুকে।

ক্রমে কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত৷ তুললেন মহিলা-প্রতিনিধিত্বের দাবী। এসব ছাড়িয়ে তাঁর দেশসেবার সবচেয়ে বড় পরিচয় আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে নিজে কুলী সেজে বসবাস করে। সেখানকার কুলীদের দুঃসহ জীবন আর ইওরোপিয় মালিকদের দুর্বিষহ অত্যাচারের খবর কলকাতার 'সঞ্জীবনী'-তে ছাপিয়ে সারা দেশে আলোড়ন জাগিয়ে তোলা। 'সঞ্জীবনী' তাঁরই প্রতিষ্ঠা-করা পত্রিকা। এবং তিনিই সম্পাদক। এসবেরই ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যকর্ম। উপন্যাস লিখেছেন একটি 'সুরুচির কুটীর'। নাটক একটি, 'বীরনারী'; অন্যান্য বই, 'কবিগাঁথা', 'জীবনালেখ্য'। পাঠ্যপুস্তক, 'সরল পাটিগণিত', 'ভূগোল', 'স্বাস্থ্যতত্ত্ব', আর ইংরেজি ইয়ারবুকের অনুসরণে 'নববার্ষিকী'।

পুণ্যলতার চোখে শৈশবের দেখা ও জানা সেই দাদামশাই —

"দাদামশাই নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে আমরা তাঁর কাছে ঘেঁষবার অবসর বেশি পেতাম না। মাঝে মাঝে গাড়ি করে আমাদের গড়ের মাঠে

ও গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, তখন তাঁর সঙ্গে বেশ হাসি গল্প হত। সবাই বলতেন যে অতিরিক্ত পরিশ্রমেই দাদামশায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। সারাজীবন তিনি সমাজের সেবায়, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছিলেন। তখন ছোট ছিলাম, সেসব কাজের মূল্য তো ভাল করে বুঝতাম না, কিন্তু তাঁর সাহস ও গায়ের জোরের কথা, বিশেষ করে 'সাহেব ঠেঙানো'-র গল্প শুনতে খুব ভাল লাগত।"

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

মাতামহী।জন্ম ভাগলপুরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ-করা প্রথম ভারতীয় মহিলা। সাল ১৮৭৮। পরে বেথুন কলেজের ছাত্রী হিসেবে তিনি আর চন্দ্রমুখী বসু বি. এ পাশ করলেন যখন, তখনও ভারতীয় মহিলা হিসেবে তাঁরা দুজনই প্রথম। অর্থাৎ ব্রিটিশ অধিকৃত সাম্রাজ্যে তাঁরাই প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। সালটা ১৮৮২। বিয়ে। মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে আরো উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত পাড়ি ১৮৯২-এ। পরের বছরেই দেশে ফিরে এলেন এডিনবরা, গ্লাসগো আর ডাবলিন থেকে যথাক্রমে এল. আর. সি. পি, এল. আর. সি. এস, আর. ডি. এফ. পি. এস উপাধি নিয়ে। কিছুদিন লেডি ডাফরিনে সিনিয়র ডাক্তারের চাকরি। পরে স্বাধীন চিকিৎসক। ১৮৮৯-এ বোম্বাই-কংগ্রেস। সেখানে তিনি নারী প্রতিনিধি। ১৯৯০-এ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বক্তৃতা দিলেন ইংরেজিতে। অ্যানি বেশান্ত-এর মতে সেটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯০৭-এ হয়েছিলেন গান্ধিজীর সহযোগী স্যার হেনরী পোলকের প্রতিষ্ঠা-করা ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি। আর একবার সদস্যা হয়েছিলেন বিহার ও উড়িষ্যার নারী শ্রমিকদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করার কমিটির অন্যতম সদস্যা।

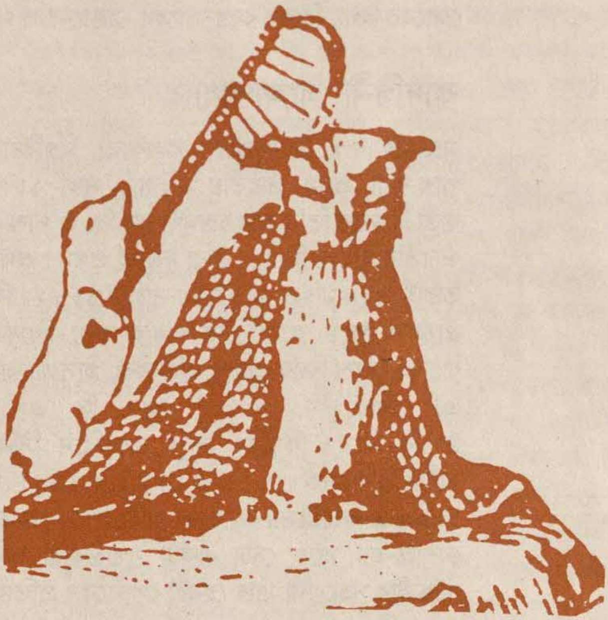


পুণ্যলতার কলমে আঁকা দিদিমার ছবি—

"আমরা জন্মাবধি যে-দিদিমাকে জানি, তিনি যে মা'র বিমাতা, ছোটবেলায় সে কথা আমাদের জানা ছিল না। প্রথম যেদিন সেকথা শুনলাম, টুনা অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সে কি ! দিদিমা বুঝি তোমার নকল মা !' 'নকল মা' কথাটা নিয়ে খুব হাসাহাসি হল।

দিদিমা ছিলেন নতুন যুগের মানুষ। আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নতির নানাদিকে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ... অসাধারণ কাজের লোক ছিলেন তিনি। ডাক্তারিতে তাঁর খুব সুনাম ও পসার ছিল, নানারকম দেশ-সেবা ও সমাজ-সেবার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। তার উপরে দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পরে সাত সাতটি সন্তানকে মানুষ করার ভার সম্পূর্ণ তাঁর হাতেই পড়েছিল। রান্না, সেলাই প্রভৃতি ঘরের কাজও তিনি খুব ভাল জানতেন। একটুও সময় তিনি নষ্ট করতেন না। তখন তো মোটর গাড়ি ছিল না, শহরের এ প্রান্ত

থেকে ও প্রান্ত রোগী দেখে বেড়াতে ঘোড়ার গাড়িতে অনেক সময় লাগতো। সেই সময়টা তিনি লেস বুনে কাজে লাগাতেন। একদিকে খুব সাহসী আর তেজস্বিনী, অন্যদিকে ভারি আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। যেখানে বসতেন হাসি গল্পে একেবারে মাতিয়ে তুলতেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলত। আমরা হাঁ করে তাঁর গল্প শুনতাম আর তাঁর সুন্দর আঙুলগুলির খেলা দেখতাম"।



হযবরল প্রসঙ্গে

সুকুমার সেন

"এঁর গল্পগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে বিদেশী রূপকথার রূপান্তর। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে দেশী ছেলেভুলোনো গল্পের ক্ষীণ অনুসরণে নিজস্ব ধাঁচে রচনা। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হল ইস্কুলে পড়া সমুচিত সরস ও কৌতুককর নিজস্ব কাহিনী। চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যেও ধরা যায় একটি দীর্ঘ রচনা, যা লুই ক্যারলের অনুসরণে অত্যন্ত চমৎকারভাবে পরিকল্পিত।...

চতুর্থ শ্রেণীর একমাত্র রচনা হল ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র অবধি সন্দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'হযবরল' (গ্রন্থাকারে ১৯২৪)। এই গল্প কাহিনীর রচনায় লেখক লুই ক্যারলের ফ্যানটাসি রীতি অবলম্বন করেছেন। রচনা যেমন কৌতুকোজ্জ্বল তেমনি প্রগাঢ়। লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। নামটির নির্বাচনে লেখকের মুন্সীয়ানার বেশ পরিচয় আছে। 'হযবরল' শিশুপাঠ্য বা ছেলেভুলানো একটি ব্যাকরণ ছড়া। এর সঙ্গে তুলনা করতে হয় 'কচতটপ' ও 'গজডদব'। প্রথম ছড়াটি বর্গের বাইরে ঘোষধ্বনির তালিকা, অপর দুটি ছড়া যথাক্রমে বর্গীয় অঘোষ ও ঘোষধ্বনির তালিকা।"

(দেশ সুকুমার রায় সংখ্যায় প্রকাশিত 'ছেলেমি রচনা ও সুকুমার রায়' প্রবন্ধ থেকে)



প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

"নিয়মতন্ত্রের মুরুব্বিদের লিয়ার তাঁর লিমেরিকে সর্বদা 'ওঁরা' (দে) বলে চিনিয়ে দেন। লিয়ার-এর 'ওঁরা' সুকুমার রায়ের সংসারে বারংবার মামারূপে অবতীর্ণ — মামার জোরই তো খুঁটির জোর। সত্যবাহনের মতন দলবাজ ধর্মধ্বজীর সেজোমামা নামক খুঁটি থাকাই তো স্বাভাবিক। একটু অবাক হই, যখন খবর পাই এমন কি, দুইলেজবিশিষ্ট বিমূঢ় বঙ্গবাসী হুঁকোমুখো



হ্যাংলারও মামার জোর আছে! 'শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার'। সাধে কি, এত জুৎসই লাগে বিশ্বকর্মার অনর্থমারণ মন্ত্র থেকে লাফিয়ে-ওঠা এই শ্লোগানঃ 'নেই মামা, তাই কানামামা'।
'গল্প বলা' কবিতায় দেখি : এক অলৌকিক মালি রাজবাড়ির ছাতের উপর মনের সাধে হঠাৎ বেহাগ গেয়ে উঠলেই রীতি-নীতি সহবতের যে-একচ্ছত্র মুরুব্বি তেড়ে আসেন, তিনি স্বয়ং রাজমাতুল। বিদ্যাভ্যাসের পাহারাদারিও মামাদের একচেটে। বোধ করি এর সবচেয়ে স্মরণীয় উদাহরণ পাচ্ছি 'হযবরল'র শেষাংশে
'হুকুম হল — ন্যাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এ রকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ "ব্যা-করণ শিং" বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারিদিকে কি রকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মত হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, "ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমোনো হচ্ছে ?" ছিল ছাগল, হয়ে গেল মেজোমামা! স্বপ্নাদ্য এই রূপান্তর-পুরাণের নিহিতার্থ ব্যর্থ হবার নয়।

(প্রস্তুতিপর্ব, বিশেষ সংখ্যা সুকুমার রায়ের প্রকাশিত 'অর্থ-অনর্থ' প্রবন্ধ থেকে)

প্রবোধচন্দ্র সেন

"— বাংলা ছন্দে প্রতি পর্বের প্রথমেই একটা ঝোঁকের ঘা পড়ে। এই ঝোঁকেরও কিছু তারতম্য থাকে। এই ঝোঁকের আঘাতেই ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে দেখা দেয় তরঙ্গিত গতিভঙ্গী। আর পর্বের প্রথমেই যদি একটা রুদ্ধদল থাকে তবে পর্বতরঙ্গ অনুভূত হয় প্রকটতররূপে। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় এই কৌশলেই ছন্দকে তালে তালে নাচাতেন। যেমন —

আজি নির্মলকায় শান্ত ঊষায় নির্জন নদীতীরে

কিংবা

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।

সুকুমার তা না করে পদের (এবং কখনও কখনও পর্বের) আদিতে বসালেন মিলের মন্দিরা। এই কৌশলে তিনি ছন্দকে সাজিয়েছেন নানা ভাবে। তারই প্রথম নিদর্শন পেলাম 'বুড়ির বাড়ি' রচনাটিতে। এরকম পদ্যাদ্য মিলের আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। —

চট করে মনে পড়ে / মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা/ কাল থেকে আছে।
দুড় দুড় ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী।

গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক করে নিভে গেল বুকভরা আশা।

এসব রচনা পড়তে পড়তে মনে হয় সুকুমার যেন ছন্দের পায়ে নূপুর পরিয়ে ও তার দুই হাতে মন্দিরা ধরিয়ে দিয়ে তাকে যেমন তালে তালে নাচিয়েছেন, তেমনি নানা সুরে ঝংকৃতও করেছেন। লক্ষণীয় এসব রচনায় লঘুযতিলোপ সযত্নে বর্জিত হয়েছে। কেননা তাতে ছন্দের তাল ভঙ্গ হয়। এরকম আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'হযবরল' থেকে —

খুশখুশে কাশি / ঘুষঘুষে জ্বর,
ফুসফুসে ছ্যাঁদা / বুড়ো তুই মর।
মাঝরাতে ব্যথা / পাঁজরাতে বাত
আজ রাতে বুড়ো / হবি কুপোকাৎ।

এই পঙক্তি একপদী। প্রতি পদে দুই পর্ব। এর মিলগুলি পর্বাদ্য, পদ্যাদ্য নয়। মিলের অবস্থান সুস্পষ্ট। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।"

(দেশ সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ছন্দশিল্পী সুকুমার রায়' থেকে)

লীলা মজুমদার

"বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্যে লেখা আর সব বই থেকে আলাদা হল 'হযবরল'। একমাত্র লুইস্ ক্যারলের অ্যালিস্ ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের সঙ্গে এর তুলনা হয়। নিন্দুকরা মাঝে মাঝে বলেন এ বইটা নাকি তার হুবহু নকল। কথাটা ঠিক নয়, তবে গল্পের অনুপ্রেরণা যে সেখান থেকেই এসেছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই; সেই গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়া, সেই অদ্ভুত বেড়াল, সেই মাথামুণ্ড কথাবার্তা, সেই বড়দের ডাকে জেগে ওঠা। সাদৃশ্য কিন্তু ঐ পর্যন্তই। 'হযবরল'-র রসটি নিতান্ত নিজস্ব, সম্পূর্ণ দেশী ব্যাপার। এর আগেই বলা হয়েছে গল্পের চেয়ে গল্প বলাটা বড় কথা, এর বেলাতেও তাই। মোটামুটি গল্পটা শোনা যাক, তবে এমন আজগুবি গল্প সংক্ষেপে বলাই মুশকিল। একটা লম্বা শোভাযাত্রার প্রত্যেকটা লোক যদি আলাদা রকমের দেখতে হয়, আলাদা রকমের কিন্তু সমান অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে, তাহলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যেমন শক্ত ব্যাপার, এও তাই।.... গল্পাংশ বলতে বিশেষ কিছু নেই; ঘটনার পারম্পর্য ও পরিণতি খোঁজা বৃথা, আজগুবীর দেশে সব কিছু আজগুবী নিয়মে চলে। তবে ঘটনা বা কথাবার্তা মোটেই এলোমেলো নয়। তার মধ্যে দিব্যি একটা পারিপাট্য আছে; এক-একজন কথা শেষ করে আরেকজনের হাতে গুছিয়ে গল্পটি তুলে দিচ্ছে। অতিরিক্ত আড়ম্বর অনিশ্চয়তাও কোথাও নেই। শেষ লাইন অবধি পাঠক উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, তারপর না জানি কে এল। রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকতে হয়, কারণ বাস্তব জগতে যদিবা যুক্তি খাটিয়ে, গল্পের শেষটি





আঁচ করা যায়, এক্ষেত্রে যুক্তিটুক্তি অচল, কাজেই গল্পের সমাপ্তি অপ্রত্যাশিত। রসের রাজ্যে যেমনটি হওয়া উচিত।

(লীলা মজুমদার রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের 'সুকুমার রায়' থেকে)

আশিস লাহিড়ী

" 'হযবরল' সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২-এর মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এর পটভূমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে অল্পকাল আগে। ঘটে গেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা (১৯১৯)। শুরু হয়ে প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে অসহযোগ আন্দোলন। ব্যক্তিগত জীবনেও এক চরম সংকটের মুহূর্ত পার হয়ে এসেছেন সুকুমার। প্রশান্ত মহলানবিশকে লিখিত 'একান্ত ব্যক্তিগত' এক পত্রে (১৯২০) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর বিশ্বাসের ভিত্ নড়ে গেছে। চারপাশে তাকিয়ে আনন্দ, অমৃত, ভূমার কোনো চিহ্ন তাঁর চোখে পড়ে না। তমসা থেকে জ্যোতির্লোকে যাওয়ার কোনো লক্ষণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, যদিও ওপর-ওপর একটা সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। সমাজের ছাত্র-শাখার একদা-উৎসাহী সম্পাদক সুকুমার 'ছাত্র সমাজে'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়। আরো একটা বিষয়ে 'হযবরল'-র পটভূমি বর্ণনায় নিতান্ত অপরিহার্য। সুকুমার রায় হালফিল বৈজ্ঞানিক কাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতেন। সব অর্থেই তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। আপেক্ষিকতার 'বিশেষ' তত্ত্ব (১৯০৪) এবং 'নির্বিশেষ' তত্ত্বের (১৯১৬) যুগান্তকারী অভিঘাত তাঁর বিজ্ঞান-সংস্কৃত সংবেদী মনে আলোড়ন তুলেছিল, তুমুল কিছু দার্শনিক প্রশ্ন জাগিয়েছিল। নিউটনীয় যান্ত্রিকতায় সাজানো বিশ্বজাগতিক মডেলের কার্যকারিতায় সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। বিশেষত, ১৯২১ সালে আইনস্টাইন নোবেল প্রাইজ পাওয়ায়, একথা অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে 'হযবরল'-র রচনাকালে এই নতুন চিন্তা তাঁর মননে প্রবলভাবে জাগরূক ছিল। 'হযবরল'-র অনেকগুলি প্রসঙ্গকে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্য ছাড়া বোঝা যায় না।"

(প্রস্তুতিপর্ব বিশেষ সুকুমার রায় সংখ্যায় প্রকাশিত 'হযবরল : অসংগতির উনিশ বিশ' রচনা থেকে)

গৌরীপ্রসাদ ঘোষ

"রুমালটা হঠাৎ 'ম্যাও' করে উঠলো। দেখা গেল ফিনফিনে সাদা রুমালটা একটা মোটাসোটা লাল বেড়ালে পরিণত হয়েছে। ছেলেটির বিস্মিত উক্তির উত্তরে বেড়ালটি বললো : "মুশকিল আবার কি ? ছিল একটা ডিম, হয়ে

গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেকে হাঁস! এতো হামেশাই হচ্ছে।" অর্থাৎ এখানে রুমালটি ছিল একটি ছোট্ট পদার্থ, বস্তু। চক্ষের নিমেষে সেটি (আপেক্ষিকতত্ত্বের কুহকে) রূপান্তরিত হয়ে গেল একটি মোটাসোটা লাল বেড়াল; অর্থাৎ একটা শক্তিপুঞ্জে—যে শক্তিপুঞ্জ স্ফীত হয়ে মূল বস্তুটির চেয়ে আয়তনে ব্যাপ্তিতে বহুগুণ বেড়ে গেছে। আর আপেক্ষিক তত্ত্ব জগতের যে নতুন সত্যচিত্রটি তুলে ধরেছে তাতে বস্তু (ভর) ও শক্তির এই পারস্পরিক রূপান্তরন রীতিমত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। Lorentz-FitzgeraldTransformationএবং Special Theory of Relativity বস্তুজগতের যে স্বতঃ পরিবর্তনশীল রূপটি তুলে ধরেছিল, রুমালের বেড়ালে রূপান্তরটি খেয়ালের জগতে তারই অপূর্ব রূপকচিত্র"।

(প্রস্তুতিপর্ব বিশেষ সুকুমার রায় সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিশু স্বপ্নলোকে নতুন বিজ্ঞানের ছায়া' রচনা থেকে)

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

"হযবরল-র খানিকটা প্রসঙ্গ সরাসরি এসেছে এলিস-উপাখ্যান থেকে, তবু ঐ বইখানির সূত্রে ল্যুয়িস ক্যারলের উল্লেখ যে নিতান্ত অ-দরকারি তার কারণ শুধু টুইডলডাম টুইডলডির তুলনায় উধোবুধোর অকিঞ্চিৎকরত্ব নয়, গোটা বইখানির আসাধারণ সরলতা। সুকুমারের শব্দাবহিত বিবেক ইচ্ছে করলে হয়তো সত্যিকার বাচস্পতির মতন ডণ্ডুন্মানিত বুগ্‌বুল্‌বলি ভাষায় সহজ হাতে বাড়িয়ে দিতে পারতো সম্ভবপরতার সীমা। জয়েসী খ্যাপামির মণিমানিক্য বসিয়ে ঝলকে তুলতে পারতো লোভন একখানা ট্যাপেস্ট্রি। যেটুকু মিলেছে তাঁর কাছ থেকে তার সাথে একই সঙ্গে মিলছে শুধু সম্ভাবনা আর অতৃপ্তি। আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁকে যেটুকু আমন্ত্রণ করে নিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু তার থেকে অনেকগুণ নিজেকে অনিবার্য করে তুলতে পারতেন তিনি নিজেই।"

(দৈনিক কবিতা সুকুমার রায় সংকলন-এ প্রকাশিত 'অসম্ভবের ছন্দেতে' থেকে)



কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

"সাধারণভাবে মনুষ্যচরিত্রের ব্যবহারে যে অতিরেক ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করি আমরা, তাকে তেমন অভিনব বলে বোধ হয় না আমাদের। কিন্তু ঐ অতিরেক ও অসঙ্গতিকে যখন তাদের আধার অর্থাৎ একটি মানুষের চরিত্র থেকে বার করে নিয়ে এসে তাদেরই একটি পৃথক ব্যক্তিত্বের রূপ দিয়ে সাজানো হয়, তখন তাই হাস্যকররূপে অদ্ভুত ও বিচিত্র বলে মনে হয়। যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে একটি বীজাণুকে বৃহত্তর করে বিকট রূপ দেওয়া হল। সমাজের দেহেও লুকিয়ে আছে এইরূপ নানা অন্যায় ও



অসঙ্গতির বীজ। সাধারণভাবে তাদের সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই; কিন্তু তাদের আলাদা করে ও বৃহত্তর করে দেখিয়ে দিলে প্রথমে হাসি পায় আমাদের — অনুভূতির পরবর্তীস্তরে সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠি আমরা। "হযবরল'-র প্যাঁচারূপী বিচারকের ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্যটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছি আমরা। লক্ষণীয় যে বিচারকরূপে প্যাঁচাকে নির্বাচন করা হয়েছে। যে কিনা দিবালোকের মুক্ত আলোয় তাকাতে পারে না। অ্যালিসের গল্পের বিচারদৃশ্যে নেংটি ইঁদুরের ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে 'হযবরল'-র বিচারকের ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্যটি শুধুই তাৎক্ষণিক মজার ব্যাপারে তুলনীয় হতে পারে। অ্যালিসের কাহিনীতে নেংটি অকিঞ্চিৎকর একটি চরিত্র, কিন্তু 'হযবরল'-এ খোদ বিচারকই ঘুমন্ত। তখন মনে হয় শুধু তথাকথিত বিচারালয় নয়, জীবনের যাবতীয় বিচারদৃশ্যেই কি এই অবহেলা ও অন্ধত্ব আমাদের নজরে পড়ে না? বিচারালয়কেও তখন জীবনের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ফললাভের নির্ধারিত ও সংহত প্রতীক বলে মনে হয়।"

(প্রস্তুতিপর্ব সুকুমার রায় সংখ্যায় প্রকাশিত 'সুকুমার রায় তাঁর দেখার ভঙ্গী' রচনা থেকে)

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

'আমাদের এক মজার খেলা ছিল 'রাগ বানানো'। হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে অথচ তার শোধ নিতে পারছি না, তখন দাদা বলত, 'আয়, রাগ বানাই'। বলে সেই লোকটির সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত সব গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতাম। তার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা হিংস্রভাব কিছু থাকত না, সে ব্যক্তির কোনও অনিষ্ট চিন্তা থাকত না, শুধু মজার মজার কথা। যত রকম বোকামি হতে পারে, যত রকমে মানুষ নাকাল ও অপ্রস্তুত হয়ে হাস্যাস্পদ হতে পারে সব কিছু সেই লোকটির সম্বন্ধে কল্পনা করে আমরা হেসে কুটিপাটি হতাম। দাদার 'হযবরল' বইয়ের 'হিজ-বিজ-বিজ' যেমন 'মনে কর' বলে যত রকম সব উদ্ভট কল্পনা করে নিজে নিজেই হেসে দমবন্ধ হবার উপক্রম করে আমাদেরও প্রায় সেই দশাই হত।"

(ছেলেবেলার দিনগুলি থেকে)


92
SR



92
SR


হ য ব র ল
সুকুমার রায়